OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 207 - 216
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

চিত্তশুদ্ধির কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাটক : একটি ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণ

মহুয়া খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mohuakhatun.96@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Mind Purification, Rabindra dramaRupak Sanketikota, mental relief, Finding existance.

Abstract
The inmates lived a monotonous life in the dark conditions of the penitentiary. As a result of which they are emotionally disturbed, it is questionable whether the correction actually takes place. That is why the West Bengal Jail Administration Department thought of reforming the inmates through theater therapy. The directors of the play selected Rabindra play as one of the means of this therapy. This article attempts to highlight how the complex theoretical drama is bringing changes in the lives of the correctional facility residents, what is the impact on their minds, and how they accept Rabindra's drama.

Discussion

> "রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ দান করেছেন সে হচ্ছে সবকিছুকে বিচার করবার একটা নূতন মাপকাঠি। তিনি আমাদের অন্তরে জাগিয়েছেন সেই দুঃসাহস যার জোরে যেখানে কোনো নাবিক যেতে সাহস করে না সেখানেও যাবার সাহস জেগেছে আমাদের বুকে, পথে চলবার চাঞ্চল্য জেগেছে আমাদের পায়ে। এই যে অজানার পানে চলবার সাহস, এই যে 'spirit of adventure' — এখানেই তো প্রগতির মূল কথা। এই অনুসন্ধিৎসা যেখানে জেগেছে সেখানে নবজীবনের স্পন্দনও শুরু হয়েছে।"[১]

সংশোধনাগারে আবদ্ধ আবাসিকদের অন্ধকারময় জীবনে আলোর স্ফুরণ জাগাতে ও নবজীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করতে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর নাটক এবং নৃত্যনাট্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যগুলি বিভিন্ন সংশোধনাগারে এবং সংশোধনাগারের বাইরে বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। যে সমস্ত নির্দেশকগণ সংশোধনাগারের নাট্যচর্চার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা সংশোধনের মুখ্য অবলম্বনরূপে মূলত বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাটককে। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত 'তাসের দেশ', 'রক্তকরবী' এবং 'রথের রশি' রবীন্দ্র নাট্যধারার এই তিনটি তত্ত্বনাটক কীভাবে ও কীরূপে আবাসিকদের মননে চিন্তনে প্রবেশ করেছে তারই অবয়ব মূল কাহিনির নিরিখে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। নাটক

তিনটি গ্রন্থাগারে প্রকাশের কাল অনুযায়ী নয়, সংশোধনাগারে যে ক্রম অনুযায়ী অভিনীত হয়েছে সেই ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

'তাসের দেশ' (১৯৩৩) :

সংশোধনাগারে নাট্যচর্চার নবইতিহাস সূচিত হয়েছে 'তাসের দেশ' নাটকটির হাত ধরে। ২০০৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মুক্তমঞ্চে নাটকটির মঞ্চায়ন হয়। নির্দেশক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। পরবর্তী সময়ে বহরমপুরের রবীন্দ্রসদন ও দিল্লির NSD তে 'তাসের দেশ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে।

চারটি দৃশ্য সম্বলিত নাটকটির একেবারে প্রথমেই দেখা যায় রাজ্যের রাজপুত্র তার দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতা কাটাতে এবং জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে সদাগরপুত্রকে নিয়ে নিরুদ্দেশ অভিমুখে যাত্রা করে। নৌকায় যাত্রাকালীন ভরাডুবি হয় এবং তারা তাসের দেশের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে ছক্কা, পঞ্জা, রাজা, রানী, গোলাম, হরতনী, রুইতন, দহলানী, টেক্কানী প্রভৃতি তাস তাসীগণ তাদের নিয়মের বেড়াজালে সৃষ্ট জীবনে বেশ সুখেই দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ করে মানুষের আগমন ও তাদের স্পর্শে বদলে যেতে লাগলো সব, ভাঙতে লাগলো নিয়ম অনুশাসন। তাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন অন্যরূপ কোনো জীবনযাত্রা তারা কখনো কল্পনা করতে পারেনি, বরং নিজেদের চোখে নিজেদেরকেই কিম্ভুত বলে মনে হয় তাদের। স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে তাদের জীবনচক্র ভেসে যায়। নিজেদের স্তব স্তোত্রের বদলে গানের কলি ফুটে ওঠে। গতে বাঁধা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্ত মনা হয়ে ওঠে, প্রেমের ঢেউ এসে দোলা দেয় তাদের হৃদয়ে। সজীব প্রাণের বেগে তাদের তাসের ইমারত ভেঙে দেয়। প্রমথনাথ বিশী 'তাসের দেশ' নাটককে কিম্ভূতরসাশ্রিত তত্ত্বনাটক আখ্যা দিয়েছেন—

> "এই নাটকের মানুষ পাত্র-পাত্রীগণ ছাড়া আর সকলেই তাস জাতীয় জীব। মানব সংসার হইতে বহুদূরে অবস্থিত একটি দ্বীপে তাহাদের বাস, সে দ্বীপ তাসের দেশ। তাস জাতীয় জীবগণের চেহারা, আচার-ব্যবহার ও মনোবৃত্তি মানুষের সঙ্গে মেলে না, তাহাদের দেখিয়া কিম্ভূত মনে হয়, তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া নাটকের মানব পাত্রদের মনে কিম্ভূতরসের উদয় হয়েছে, তাই নাটকটিকে কিম্ভূতরসাশ্রিত বলা হইল।"[২]

'তাসের দেশ' সম্পর্কে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর রবীন্দ্রনাট্যের ধারা প্রবন্ধে জানিয়েছেন –

> "তাসের দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে – অচলায়তন নিষ্প্রাণ জাতীয় সমাজের সমালোচনা ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সাহায্যে 'স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা,' তাসানীদের মুখেই রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যায়— 'ভাঙতে হবে, এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডী, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা। অর্থহীন নিয়ম, মনন শূন্য মন্ত্র, চলন শূন্য চাল, জ্ঞান অনুভব ইচ্ছার অবরোধ— এইসব বিকৃতি ও কুসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে বহুবার বহুভাবে সতর্ক করতে চেষ্টা করেছেন। তাসের দেশ এইসব চেষ্টারই অন্যতম ফল।"[৩]

সুতরাং এখন এই প্রশ্নটি অবশ্যই উঠে আসবে যে এইরকম জটিল তত্ত্বনাটক সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছে কীরূপে প্রতিভাত হয়েছে? এই রকম তত্ত্বের সাযুজ্য তারা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে কী?

সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছে 'তাসের দেশ' : প্রদীপ ভট্টাচার্য তাঁর এই নাটক নির্বাচনের কারণ হিসেবে জানান 'জেলের যা পরিমণ্ডল এবং সিস্টেম যেভাবে চলছে দেখেই মনে হল 'তাসের দেশ''। বাস্তবিক জেল বা সংশোধনাগার এমন একটি নিয়ম অনুশাসনে আবদ্ধ পরিমণ্ডল যেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, আবাসিকদের প্রতিটি মুহূর্ত বিধি নিষেধ দ্বারা আবৃত। তার ব্যতিক্রম হলেই প্রশাসন কর্তৃক নেওয়া হয় উপযুক্ত পদক্ষেপ। সেখানে আবাসিকদের নেই কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা বা নিজের ইচ্ছে অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ। এই নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নিষ্পেষিত আবাসিকদের অবস্থা 'তাসের দেশ' নাটকের তাসেদের মতোই। যাদের জীবনে নিজস্বতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বলে কিছুই নেই আছে কেবল নিয়ম।

তাই আবাসিকরা নাটকের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে নিজেদের খুব ভালোভাবেই রিলেট করতে পারেন। নাটকের অন্তর্বর্তী তত্ত্বকেও তারা নিজেদের মতো করে অনুধাবন করতে পারেন। রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্রের তাসের দেশে আগমনে যেমন তাদের অন্তরে প্রেম ও প্রাণের পরশ লাগে, সমস্ত একঘেয়েমি ও জড়তা কেটে যায়, তারা খুঁজে পায় নিজেদের পরিচয় ও অস্তিত্ব তেমনি নাটক, নাটকের পাশাপাশি নাচ গান আবাসিকদের জীবনে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে আসে। তারা ওই বদ্ধ জীবনেও খুঁজে পান আনন্দের উন্মাদনা। ‘তাসের দেশ’ নাটকের গান, ছন্দ, তাল, লয় তাদের জড়তা কাটিয়ে দেয়। তারা ‘অসংখ্য বন্ধন মাঝে’ও মুক্তির স্বাদ পান। একক সত্তা ভুলে তারা অনেকের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান। এখানেই তাসের দেশ আবাসিকদের মর্মে যথার্থতায় উন্নীত হয়। তবে একটি বিতর্কের জায়গা অবশ্যই উঠে আসে তাসানীদের সংলাপ থেকে– ‘ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডী, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থকের আবর্জনা’ এই বার্তা বন্দিদের মনে কী প্রভাব ফেলবে? তারা কী সত্যিই উদ্যত হবেন বন্ধনকে ভেঙে ফেলতে? এখানেই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব আবাসিকদের উজ্জীবিত করে যে তত্ত্ব তাদের জীবনে আক্ষরিক অর্থে প্রতীয়মান হয় না, হয় ভাবার্থে। কারণ তারা শত চেষ্টা করলেও তাদের জীবনের একঘেয়েমিতা, নিয়ম অনুশাসন, শৃঙ্খল বা বন্দিদশা অর্থাৎ ওই নির্জীবের গণ্ডী, অলসের বেড়া বা নিরর্থকের আবর্জনা ভেঙে ফেলতে পারবেন না। যা পারবেন তা হল সেই আবদ্ধ অসহ্য বিরক্তিকর জীবনে নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ও আনন্দের দোলা লাগাতে। আর পারেন নিজের মনের মধ্যে যে আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছে, প্রাণে যে জড়তা বাসা বেঁধেছে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। নিজের একটা পরিচয়, যে পরিচয় তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে, বন্দিদশাতেও সেই পরিচয় তারা ‘তাসের দেশ’ নাটকের হাত ধরেই খুঁজে পান।

‘রক্তকরবী’ (১৯২৬) :

চারটি সংশোধনাগারে অভিনয়ের জন্য ‘রক্তকরবী’ নাটকটিকে নির্বাচন করা হয়। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, হাওড়া জেলা সংশোধনাগার, দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ও কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নাটকটি বহু স্থানে বহু নাট্যগোষ্ঠী বহুবার মঞ্চস্থ করেছে কিন্তু সেইভাবে জনপ্রিয়তা কোনো দলই পায়নি। এরকম একটি জটিল নাটক যা মঞ্চ সফল হতে প্রায় প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছে সেই নাটকটি সংশোধনাগারের আবাসিকদের জন্য কেন নির্বাচন করা হল? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য নাটকের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী সৃষ্টি ‘রক্তকরবী’ একটি দৃশ্য সম্বলিত তত্ত্বনাটক। যেখানে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্বই মুখ্যভাবে প্রতীয়মান। নাটকের স্থান যক্ষপুরী, সেখানে খোদাইকররা সোনা তোলার কাজে ব্যস্ত। এই যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ নিজেকে জালের আড়ালে রেখেছেন। যক্ষপুরীর ছন্দহীন জীবনে প্রাণের সুর নিয়ে হঠাৎই আগমন ঘটে নন্দিনীর। নন্দিনী ও কিশোরের কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকের সূচনা হয়। রক্তকরবীর ফুল নন্দিনীর কাঙ্ক্ষিত, কিশোর বহু খুঁজে তা এনে দিয়েছে নন্দিনীকে এবং এর পরবর্তী সময়েও এই দায়িত্ব তার ওপরেই অর্পিত হয়। অধ্যাপকের উপস্থিতি ও সংলাপে নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি প্রস্ফুটিত হয়। নন্দিনী তাকে চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, তারা মরা ধনের সাধনা করে, তারা নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ; এই মরা ধনের শক্তি যেমন প্রবল, তাদের রাজার ক্ষমতাও তেমন প্রচুর। কিন্তু নন্দিনীকে অধ্যাপকের ভালো লাগে, একটি রক্তকরবীর ফুল দাবী করলে নন্দিনী রঞ্জনের আগমনের খুশিতে একটি ফুল অধ্যাপককে দেয় এবং জানায় রঞ্জনের আগমনে যক্ষপুরীর মরা পাঁজরে প্রাণ দেখা যাবে। এরপর নানা চরিত্রের আগমনে ও সংলাপের ঘনঘটায় নাটকের কাহিনি এবং যক্ষপুরীর ভিতরের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোকুলের মনে হয়েছে নন্দিনী ভয়ংকরী ও সর্বনাশী। এছাড়া তার ধারণা দিনশেষে কোনো বিপদ নিশ্চয় ঘনিয়ে আসবে। নাটকের রাজা জালের আড়াল থেকেই নন্দিনীর ডাকে সারা দেয়, নন্দিনী রাজার কাছে যেতে চায়, রাজাকে ফসল কাটার মাঠের সরল আনন্দের গান শোনাতে চায়। রাজার সময় নেই কথা বলার তবু নন্দিনীর সাহচর্য যেন অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয় রাজার চিত্তে। রাজা তাকে পেতে চায় হাতের মুঠোয়, নন্দিনী একান্তভাবে রঞ্জনের জেনে ঈর্ষা হয় তার। রাজার হৃদয়-বিদারক বক্তব্যে স্তম্ভিত হয় নন্দিনী –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি- তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"[৪]

রঞ্জন আজ আসবেই সেই খবরকে আরো দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে নন্দিনী বিদায় নেয়। এরপরেই নাটকের একটি অন্য অধ্যায় দেখানো হয় যেখানে রয়েছে খোদাইকর ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রা। ধ্বজাপূজোর ছুটির দিনে ফাগুলাল মদ খেয়ে মাতাল হতে চায় কিন্তু চন্দ্রা তাতে নারাজ। বিশুপাগলের আগমনে মুখরিত হয় পরিবেশ। চন্দ্রা জানায় বিশুকে নন্দিনীতে পেয়েছে এবং নিজের স্বামীকেও নিয়ে তার এই ভয়। এই প্রসঙ্গে বিশু বলে —

> "এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।"[৫]

কিন্তু এখানকার মানুষ কাজ থেকে অবসর পায় না, পায় না ছুটি। দেশে ফেরার ইচ্ছা তাদের মরে গেছে। বিশু প্রথমে যক্ষপুরীর রাজার চর হয়ে হিসেবে নিযুক্ত হয়, এখন সেও খোদাইকর। চন্দ্রা, বিশু ও ফাগুলালকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায় কিন্তু ফেরার উপায় নেই। সর্দারকে চন্দ্রা দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সর্দার জানায় কী পরিমানে আরামে রাখা হয়েছে তাদের, এমনকি ভালো ভালো কথা শোনানোর জন্য কেনারাম গোঁসাইকেও আনানো হয়েছে। গোঁসাই তাদের অন্ধভাবে কাজ করতে ও 'হরি হরি' বলতে উপদেশ দেয়। ফাগুলাল তার ভণ্ডামির প্রতিবাদ করলে সর্দার নিজেই তাদের শেখানোর ভার নেয়— গোঁসাই শুধু ট, ঠ, ন পাড়ায় ও করাতী পাড়ায় শেখাবে। সর্দারনীদের ধ্বজাপূজোর ভোজে যাওয়ার দৃশ্য দেখে চন্দ্রা ও ফাগুলাল বিদায় নেয়। বিশুর মুখোমুখি হয় নন্দিনী। বিশু তাকে গান শোনায়। বিশুর কাছে নন্দিনী 'দুখ জাগানিয়া'। নন্দিনী বিশুকেও যক্ষপুরী থেকে মুক্ত করতে চায়, নন্দিনীর মধ্যে বিশু আলো খুঁজে পায়। রাজা সম্পর্কে সে বিশুকে জানায় রাজা মানুষ কিন্তু প্রকাণ্ড। সর্দারের উপস্থিতি এবং বাক্যবানে প্রকাশিত হয় রঞ্জনের আগমন বার্তা, শুনে খুশি হয়ে নন্দিনী সর্দারকে একটু কুন্দ ফুলের মালা দেয়। এরপর বিশুকে সঙ্গে নিয়েই নন্দিনী রাজার কাছে যায়। তাদের কথপোকথনে রাজার মনের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। রাজার হাতের মরা ব্যাঙ, ব্যাঙটি রাজাকে কী করে টিকে থাকতে হয় তার শিক্ষা দিয়েছে, কিন্ত কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সে শিক্ষা রাজা পায়নি। নন্দিনীকে ফলের রসের মতো দলবার ও তার চুলের মধ্যে ঘুমানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজা। নিজের বিছানায় নীলকণ্ঠ পাখির পালকের উপস্থিতি নন্দিনীর মনে রঞ্জনের আগমন ধ্বনিকে আরো দীপ্ত করে।

এরপরের অংশ সর্দার ও মোড়লকে নিয়ে বিস্তৃত। রঞ্জনের যক্ষপুরীতে প্রবেশের বিরুদ্ধে সে, কিন্তু তার সর্ব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রঞ্জনের দল ভারি হয়ে উঠেছে মেজো সর্দার রঞ্জনের দলে যোগ দিয়েছে। অধ্যাপক তার বস্তুবিদ্যার জ্ঞানে রাজাকে খুশি করতে পারছে না, তাই পুরাণ কথা শোনানোর জন্য পুরাণবাগীশকে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে শ্লথ গতিতে যখন নাট্যকাহিনি এগিয়ে চলেছে তখন দ্রুত বেগে নন্দিনীর প্রবেশ ঘটে। একদল জীর্ণ লোক যাদের 'রাজার এঁটো' বলে সম্বোধন করেছে সর্দার, তাদের দেখে সে তাদের দুর্গতির কথা জানতে চায়, কিছু চেনা মুখ অনুপ, উপমন্যু, শকলু, কঙ্কু যারা চিনতে পারে না তাদের ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকে। এই কঠিন দৃশ্যে ব্যথিত হয় সে, জগৎ বিখ্যাত পালোয়ান গজ্জুর দুর্দশায় তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। অন্যদিকে বিশুকে হাত বেঁধে বিচারশালায় নিয়ে যাওয়া হয়, চাবুক মারা হয়, বিশু নির্ভীক। কিশোর কাজ কামাই করে রঞ্জনের খোঁজে গেছে বলে তার পিছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া হয়। নাট্য ঘটনায় আসে চাঞ্চল্য। চিকিৎসক এসে জানায় অন্য রাজ্য বা নিজের প্রজাদের সঙ্গে রাজার বিবাদ আসন্ন। সর্দার এই আসন্ন বিরোধের জন্য প্রস্তুত। নন্দিনী সকলের সামনে গোঁসাইয়ের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেয় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তোমাদের ঐ ধ্বজাদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে? মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।"[৬]

বিশুর অবস্থার জন্য চন্দ্রা নন্দিনীকে দায়ী করে। গোকুল আর চন্দ্রা রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি খারাপ আচরণ ও কটু ভাষা প্রয়োগ করে। ফাগুলাল কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে এনে বন্দিশালা চুরমার করে ভেঙে ফেলার পরামর্শ দেয়। এইভাবে পরিস্থিতি যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায় তখন নন্দিনী ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যকুল হয়ে রাজার কাজে ছুটে যায়, অস্থির হয়ে দরজা খুলে দিতে বলে। ঘটনাধারা চরম মুহূর্তে পৌছায়, নন্দিনীর বারংবার আহ্ববানে রাজা দরজা খুলতে বাধ্য হয়, দুয়ার উন্মোচিত হতেই দেখতে পায় শায়িত রঞ্জনের মৃতদেহ। কিন্তু রঞ্জন তো মরতে পারে না, তাই তো নন্দিনী বলেছে মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেয়েছে, রঞ্জন বেঁচে উঠবে –

> "বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি..."[৭]

কিশোরকেও রাজা মেরে ফেলেছে, রাজা অহংকারী, দাম্ভিক তার নিজের ভিতরের দ্বন্দ্ব এই পরিণতির জন্য দায়ী। নন্দিনী রাজাকে লড়াইয়ে আহ্ববান করে, সমস্ত ঘটনার পরিণতি স্বরূপ রাজাও তার উত্তরে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা জানায়, বলে –

> "আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিন! ...আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা। আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।"[৮]

ফাগুলাল বন্দিশালা ভেঙে বিশুকে উদ্ধার করতে চায়, রাজা জানায় তিনিও আজ ভাঙার দলে। রাজার বিপক্ষে এখন সর্দার। দলবল নিয়ে সর্দার আসছে জেনে ফাগুলাল নন্দিনীকে নিরাপদ স্থানে যেতে বলে কিন্তু নির্ভীক নন্দিনী নিজের বুকের রক্তে সর্দারের বর্শার ফলককে রাঙিয়ে দিতে চায়। নন্দিনী ছুটে যায় সবার আগে। অধ্যাপকও এগিয়ে এসে রাজার পথ ধরে, ফাগুলাল তার কারণ জানতে চাইলে, সে জানায় –

> "কে যে বললে, রাজা এতদিন পড়ে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।"[৯]

কারিগররা সবাই বন্দিশালা ভেঙে ফেলে, বিশু বেরিয়ে নন্দিনীকে খোঁজে। ফাগুলাল জানায় ধুলোয় লুটোচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। তারা নন্দিনীর জয়গান করে, দূরে শোনা যায় ফসল কাটার গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয়।' নাট্য ঘটনা এই পর্যন্ত। নাটকটির পটভূমিকা বিচার করতে গিয়ে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন –

> "পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুব্ধ বহু সংগ্রহী ধনতন্ত্রবাদ 'রক্তকরবী'র পটভূমিকা...রক্তকরবীতে জোর দেওয়া হইয়াছে ইহাদের বহুগ্রাসী উৎকট সংগ্রহশীল ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন –

> "আমার নাটক ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতলা খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।”[১১]

পাশাপাশি নাটকের সূচনা অংশে তিনি নাটকটিকে ‘সত্যমূলক’ আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী ‘রক্তকরবী’ নাটককে ‘তত্ত্বমূলক’ নাটকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের রূপক ব্যাখ্যা করে রক্তকরবীর মধ্যে যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব আছে সে কথারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে ‘রক্তকরবী’কে অবশ্যই রূপকের আড়ালে বেড়ে ওঠা সাংকেতিক নাটক বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনিকে বাস্তব বলে মনে হলেও যার প্রতিটি পরতে রয়েছে সংকেত। চরিত্র থেকে শুরু করে সংলাপ সবটাই প্রতীকের দ্বারা আবিষ্ট। সাধারণ পাঠকের কাছে এটাই ‘রক্তকরবী’ কিন্তু সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছেও কী এইভাবে ‘রক্তকরবী’ প্রতিফলিত হয়েছে? হয়তো না। কারণ এত জটিলতা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছে ‘রক্তকরবী’ : যক্ষপুরীর সোনা খোদাইকরদের জীবনে কোনো প্রাণ নেই, তারা জড় পদার্থের মতো মকররাজ ও সর্দারদের শাসন অনুশাসনে আবদ্ধ, আটক রয়েছে নিয়মের বেড়াজালে। তাদের বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা ওই একই কাজে ব্যস্ত। সংশোধনাগারের আবাসিকদের জীবনটাও এইভাবেই অতিবাহিত হয়। প্রশাসনের নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা কিছুই করতে পারেন না। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছে ৪৭ফ, ৬৯ঙ। বিশুর মুখেই —

> “আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক্‌। বুকের ওপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।”[১২]

সংশোধনাগারের আবাসিকদের ও সংখ্যা দ্বারা গুনতি করা হয়, একবার না বহুবার। ধ্বজাপূজা, অস্ত্রপূজা প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলি পালন করা হয় যেমন যক্ষপুরীর অধিবাসীদের আনন্দ দান করার জন্য, মনে স্ফূর্তি আনানোর জন্য তেমনি সংশোধনাগারের আবাসিকরা খেলাধূলা ও পালাপার্বণ পালনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে। নাটকের এই অংশগুলোর সঙ্গে আবাসিকরা নিজেদের অন্বয় সাধন করতে পারবে। তাই হয়তো পরিচালক প্রদীপ ভট্টাচার্যকে আবাসিকরা প্রশ্ন করেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ কি জেলে ছিলেন? তা না হলে জেলের ভিতরের জীবন সম্পর্কে তিনি এত কিছু জানলেন কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ যে সর্বত্র রয়েছেন তারা হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের মিল পেলেও নন্দিনীর আবির্ভাব তাদের কাছে কীরূপে প্রকাশ পাবে? বস্তুত নন্দিনী হল প্রাণ, সৌন্দর্য এবং প্রেমের প্রতীক। এই ত্রিধারা জেল বন্দিদের জীবনে একেবারেই প্রবাহিত হওয়ার অবকাশ পায় না। তাই নন্দিনীর রূপ নিয়ে নাটক তাদের জীবনের ওই অপূর্ণতার কিছুটা হলেও পূরণ করতে আসে। যক্ষপুরীর প্রাণহীন জগতে নন্দিনীর আবির্ভাবে যেমন প্রাণ এসেছিল, আনন্দ এসেছিল, এসেছিল সৌন্দর্য নাটক বা সাংস্কৃতিক চর্চাও সংশোধনাগারের আবাসিকদের প্রাণহীন একঘেয়ে জীবনে আনন্দ ও প্রাণের ছোঁয়া লাগায়। তাদের একাকীত্ব, যন্ত্রণাময় বদ্ধ জীবনে প্রাণের সারা জাগায় নন্দিনী। সেই কারণেই নন্দিনীকে তারা উপলব্ধি করতে পারেন। সৌন্দর্যকে তারা গ্রহন করতে সক্ষম হয়, কঠিন পরিবেশেও কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সেই মন্ত্র দেয় নন্দিনী। আর নন্দিনীর মধ্যে থাকা এই প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বস্তু নিরপেক্ষ ভাবটি রক্তকরবী ফুলের সংকেতে ব্যক্ত। তাই রক্তকরবী ফুলের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতেও তারা পারেন। কিশোর এবং রঞ্জন যথাক্রমে কৈশোর এবং যৌবনের প্রতীক। অনেকেই দীর্ঘদিন সংশোধনাগারের চার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেওয়ালে আবদ্ধ রয়েছেন, তারা উপলব্ধি করতে পারেন কীভাবে তারা তাদের যৌবনকে নষ্ট করেছেন, জীবনের মূল্যবান সময়কে ভুলের বশে শেষ করে ফেলেছেন। ঠিক যক্ষপুরীর রাজার মতো, রাজা যেমন বলে —

> "আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।"[১৩]

সুতরাং এই বিষয়টা স্পষ্ট যে সংশোধনাগারের আবাসিকরা সকলেই স্বয়ং মকররাজ। তারা যেমন গারদের আড়ালে বন্দি, মকররাজও নিজেকে জালের আড়ালে বন্দি করে রেখেছে। এই রাজার যেমন ভালো খারাপ দুটি সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে তেমনি সংশোধনাগারের আবাসিকদেরও এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে, কেবল পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে তাদের খারাপ সত্তাই বহিঃপ্রকাশিত হয়েছে। যার শাস্তি স্বরূপ তারা বন্দি দীর্ঘদিন যাবত। কেবল শারীরিক ভাবে নয় মানসিক দিক দিয়েও তারা বন্দি। মানসিক বন্দিদশা থেকে নন্দিনী তাদের মুক্ত করে। যেমন ভাবে রাজার ভিতরের দ্বন্দ্ব লাঘব করে ভালো সত্তাকে বাইরে আনা এবং তার মনের মুক্তি ঘটানোর কাজটাই করেছিল নন্দিনী। নন্দিনীর ডাকে কারিগররা যে বন্দিশালা ভেঙে দিয়েছিল সেটির আক্ষরিক অর্থ যাই থাকুক না কেন অন্তর্নিহিত অর্থ মনের বন্দিদশা ঘুচিয়ে মনকে মুক্ত করা। এই মুক্তির ডাক দিয়েছিল নন্দিনী, সারা দিয়েছেন আবাসিকরা। তারা পেরেছেন তাদের মনের অন্ধকারকে দূর করে আলোর পথে যাত্রা করতে। এখানেই নন্দিনীর জয়, এখানেই রক্তকরবীর জয়, এখানেই জয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

রথের রশি (১৯৩২) :

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নাট্যকার সাধন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'রথের রশি' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২০১৬ সালের ৪ জুলাই জলপাইগুড়ি কলা কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাট্যের ধারা প্রবন্ধে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন —

> "রথের রশি একাঙ্কিকায় রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন– সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবধান ও তিক্ততা যখনই বেড়ে যায় তখনই সমাজ রথ আর চলে না– বিপ্লব আসে; তখন নতুন চালকের আবির্ভাব হয় এবং তার হাতের টানেই রথ চলতে থাকে। ...সমাজ যে পর্যায়েই থাকে, তার শ্রেণী সম্পর্কের, ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে সাম্য, সামঞ্জস্য থাকা চাইই। সমাজ রথকে যে দড়িতে টেনে নিয়ে যায় সে তো বাইরের কিছু নয়, সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।"[১৪]

কাহিনি আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাক— অনতিদীর্ঘ তত্ত্বনাট্য 'রথের রশি'র সূচনা পর্বেই রথযাত্রা উৎসব। সেই উপলক্ষে বসেছে মেলা। প্রাতঃস্নান সেরে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতি বছরের ন্যায় রথের জন্য অপেক্ষারত। কিন্তু রথের দেখা পাওয়া যায়না। রথের দড়ি যারা টানে তারা বহু চেষ্টা করেও রথের চাকা নড়াতে পারছেনা। রথের চাকা নড়ানোর জন্য পুরোহিত তার জ্ঞাত মন্ত্র বহুবার উচ্চারণ করেছেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ক্ষমতা এবং শাস্ত্রে পারদর্শী 'মহাকালের পাণ্ডা' বা সমাজপতিদের দুর্দশা দেখে হতাশ হয়েছে সাধারণ মানুষ, বিশেষত মেয়েরা। মেয়েরা তাদের ভক্তির আতিশয্যে দড়ির উপর ঘি-দুধ, গঙ্গাজল ও পঞ্চপ্রদীপের সমারোহ দেখা দেয় কিন্তু রথ তার জায়গায় অটল। এরপর নিরুপায় হয়ে রাজা সৈন্যদের সাহায্যে রথ চালাতে চাইলে তিনিও নিশ্চেষ্ট হন। রাজার আদেশে রথের চাকা নড়াতে আসে বৈশ্যরা। আধুনিক সময়ে এই ধনিকশ্রেণি সমাজের চালিকাশক্তি কিন্তু তারা অর্থের অহংকারে মানুষকে করেছে অপমান, মানুষকে তারা পণ্যের সামগ্রী হিসেবেই ব্যবহার করেছে, এটা কেবল আধুনিক কালের নয় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেই কারণে রথ চলেনি বৈশ্য শক্তির হাতেও মহাকাল তাদেরও ক্ষমা করেনি। ফলত রশিটা আরও শক্ত হয়ে ওঠে, তাদের হাতে দেখা দেয় পক্ষাঘাত। এমন সময়ে শূদ্রপাড়া থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে রথের দড়ি টানতে। পুরোহিতের অভিশাপ ও সেনাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা দড়ি টানতে এবং রথের চাকা ঘোরাতে সফল হয়েছে। শূদ্র দলপতির বক্তব্য —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সংসার কি তোমরা চালাও ঠাকুর।... আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ, আমরাই বুনি বস্ত্র তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।"[১৫]

তবে রথ কিন্তু চির প্রচলিত পথে চললো না। কাঁচা পথ ধরে পল্লীর দিকে ছুটলো। ধনপতির দল দেখলো রথ তাদের ধনভাণ্ডারের দিকে চলেছে, সৈনিক লক্ষ করলো রথের গতি অস্ত্রশালা অভিমুখে। সকলেই ছুটলো নিজ নিজ সম্পদ রক্ষার্থে, রথের এই অভাবনীয় গতিতে সবাই যখন স্তম্ভিত ঠিক সেই সময় কবির প্রবেশ। তিনি জানান দম্ভ, অহংকার এক শ্রেণির মানুষকে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলেছিল সেই কারণে মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হচ্ছিলনা। এক শ্রেণির ঔদ্ধত্যকে খর্ব করার জন্যই আর এক শ্রেণির অভ্যুত্থান প্রয়োজন ছিলো। কবি তাই বলেছে –

> "একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
> ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
> সেইখান থেকে মারলেন টান,
> বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে।
> সমান করে নিলেন তার আসনটা।"[১৬]

সাম্যবাদ এই নাটকের মূল উপজীব্য। মানুষে মানুষে সমাজে সমাজে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সেটাই রথের রশি। সেই রশির গ্রন্থি শিথিল হলে বাঁধন আলগা হয়ে আসে, তখন দড়িতে টান পড়লেও সে রথ চলে না বা চললেও তার গতিবেগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখনই ছন্দহীন মানব সমাজের বুকে ছন্দের পুনরাবির্ভাবের জন্য কবির ডাক পড়ে।

> "মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, সমাজে সমাজে অবহেলা, দেশে দেশে হিংসা- সেই তো ছন্দপতন। সমগ্রকে না হইলে ছন্দপতন হয় না। কিন্তু আজ সমগ্রের যথাযথ সমাবেশ কোথায়? কে কাহার আগে যাইবে, কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহারই তো প্রতিযোগিতা! ইহা আর কিছুতেই নয়, মানব সমাজের ছন্দভ্রংশের লক্ষণ।"[১৭]

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়েও সচেতন করেছেন যে হাওয়া চিরকাল একই অভিমুখে বইতে পারে না কারণ নবজাগ্রত শূদ্রশক্তি যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে নিজেদের প্রভু রূপে ও অন্যদের দাস রূপে গণ্য করে তখন আবার সামঞ্জস্য বিনষ্ট হবে, আবার হবে ছন্দপতন, রথ হবে অচল। তখন –

> "আসবে উল্টোরথের পালা। তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।"[১৮]

নাটকটিতে নাট্যকার রথের রশির রূপকের নিরিখে বার্তা দিয়েছেন সমাজের সমতাবিধানের প্রয়োজনীয়তার। উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূরীকরণের মধ্যে দিয়েই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব সেই সঙ্গে এতদিনের নির্যাতিত, মানসিকভাবে ভগ্নপ্রায় শ্রমিক শ্রেণির উত্থান ও ন্যায্য মর্যাদা প্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করেছেন –

> "আজকের মতো বলো সবাই মিলে,
> যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
> তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"[১৯]

সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছে 'রথের রশি' : উপরিউক্ত নাটকে কবির শেষ সংলাপটি আবাসিকদের উপর প্রভাব ফেলেছে সব থেকে বেশি। সংশোধনাগারের ভিতরে যাদের সত্তা মৃত্যুমুখী, যাদের না আছে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করার ক্ষমতা না আছে সুস্থভাবে বাঁচবার অধিকার। তাদের কাছে এই সংলাপ সুধার মতো বর্ষিত হয়েছে। তারা যে হীনমন্যতায় ভুগছে সেটাও দূরীভূত হয় এই বার্তায়। সমাজের চোখে সবথেকে অপরাধী যারা, তারা নিজেদের শূদ্রপাড়ার ওই অধিবাসীদের

সঙ্গে সংযোগ করতে পারে এবং সমাজের অঙ্গ হিসেবে তারা কেবল অপরাধী রূপেই জীবন নির্বাহ করবে না, ওই খোলস থেকে বেড়িয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে তারাও অংশগ্রহণ করতে পারে এ বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারে। অন্যদিকে এই বোধটিও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে যাদের স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাবে তাদেরকে মহাকালের নিয়মে নিজের অবস্থান থেকে সরে যেতে হবে। সকল মানুষ যে সমান, সকলেই যে সমাজের চালিকাশক্তি, সংশোধনাগারে থাকাকালীন এই চেতনা তাদের লুপ্ত হয়। তাদের অন্তঃস্থল কেবল নিজেকে হীন, ছোটো ও আসামীরূপে খুঁজে পায় এর জন্য অবশ্যই প্রশাসন অনেকাংশে দায়ী। এই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে তারাও যখন সমতা অনুভব করতে পারে তখনই রবীন্দ্রনাটক 'রথের রশি' সংশোধনাগারে নাট্যচর্চায় সার্থকতা পায়।

সমগ্র আলোচনার পরিসমাপ্তিতে একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাটক সংশোধনের একটি মাধ্যম। রবীন্দ্রনাটকের কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, গূঢ় তত্ত্ব যা সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও মনকে সমৃদ্ধ করে সেরকমই খুব সহজ ও সাবলীলভাবে আবাসিকদের জীবনেও রবীন্দ্রনাটকের সারবস্তুটি জায়গা করে নিতে পারে। নাটক পাঠ ও অভিনয়ের দ্বারা তারা নিজেদের পরিবর্তন করতেও সমর্থ হন। এখানেই রবীন্দ্র নাটকের সার্থকতা।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল, 'রবীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৭৯
২. বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ' (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ৮ম সং, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ২৭৭
৩. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, 'রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ২০০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', 'রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৭৬
৫. তদেব, পৃ. ৭৯
৬. তদেব, পৃ. ১০১
৭. তদেব, পৃ. ১০৩
৮. তদেব, পৃ. ১০৪
৯. তদেব, পৃ. ১০৫
১০. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ৯ম সং, আষাঢ় ১৪২৬, পৃ. ৩০৯
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গ্রন্থপরিচয়', 'রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৯৩৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', 'রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৮০
১৩. তদেব, পৃ. ১০৩
১৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, 'রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ১৯৮
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রথের রশি', 'রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৫৮৩
১৬. তদেব, পৃ. ৫৮৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 207 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ' (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ৮ম সং, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ২৭৬

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রথের রশি', 'রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৫৮৯

১৯. তদেব